OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 253 - 259
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
**A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 253 - 259
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

# আখ্যান কথক ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত শিশু-কিশোর উপন্যাস

পাপিয়া মিত্র
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: papiyamitra895@gmail.com

***Received Date*** *28. 09. 2025*
***Selection Date*** *15. 10. 2025*

***Keyword***
*Narrative, Narrator, Narratee, Speech, Point of view.*

***Abstract***
*Almost every children's novel by Shirshendu Mukhopadhyay is diverse and uniquely flavored. At the same time, one also finds features of Narratology within them, which add a different dimension to the storyline. This makes his novels both adventurous and imaginative. Two of the key aspects of narratology are narrator and point of view. In Shirshendu Mukhopadhyay's children's novels, we can almost always notice these two aspects. Sometimes, who is speaking and who is seeing are presented together, and sometimes they are presented separately in the narrative. In most of his works, the omniscient narrative style can be seen—for example, Monojder Adbhut Bari (The Strange House of the Monoj Family), Hetamgarh-er Guptadhan (The Hidden Treasure of Hetamgarh), Paglasaheber Kobor (The Grave of Paglasaheb), Nabiganj-er Daitto (The Giant of Nabiganj), Haripur-er Harek Kando (The Many Incidents of Haripur), etc. Yet each of these novels carries a distinct originality in terms of story. The omniscient narrator sometimes observes very closely, while at other times maintaining a certain distance. Along with the omniscient narrator, in some novels we also find the presence of character-narrators. For instance, in Hirer Angti (The Diamond Ring), Kunjopukur-er Kando (The Incident of Kunjopukur), Dudhsayorer Dwip (The Island of Dudhsayor), etc. With the change of narrator, the mode of narration also changes, creating multiple narrative layers. Sometimes the character-narrators try to step beyond their limits and take on the role of omniscient narrator, though they ultimately fail to achieve that. Thus, on one hand, the omniscient narrator offers expansive observation, while on the other, the character-narrator's limited point of view presents a contrasting experience to the reader. From a narratological perspective, this study emphasizes the narrator and his point of view. For convenience of discussion, three of Shirshendu Mukhopadhyay's children's*

*novels have been chosen—Paglasaheber Kobor (The Grave of Paglasaheb), Nabiganj-er Daitto (The Giant of Nabiganj), and Dudhsayorer Dwip (The Island of Dudhsayor).*

## Discussion

আখ্যান কথক বা narrator - তাঁর কথনের মাধ্যমে আখ্যান কাহিনি পরিবেশন করে থাকেন শ্রোতা-পাঠকের উদ্দেশ্যে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শিশু-কিশোর উপন্যাসেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কাহিনির বাইরে থাকা সর্বজ্ঞ কথক বা কাহিনির ভেতরে থাকা চরিত্র কথক উভয়ে আলাদা করে নজর কেড়েছে। কখনো সর্বজ্ঞ কথকের বিবরণ বেশি, কখনো চরিত্রের সংলাপ বেশি রয়েছে। কখনো আবার কাহিনি এগিয়েছে কথকের বিবরণ ও চরিত্রের সংলাপে পাশাপাশি। উক্ত আলোচনায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত শিশু-কিশোর উপন্যাসে আখ্যানের কথক ও দৃষ্টিভঙ্গি - এই দুটি দিক কতটা, কীভাবে পাওয়া গেছে মূলত তার ব্যাখা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি উপন্যাসকে বেছে নেওয়া হয়েছে – ‘পাগলাসাহেবের কবর’, ‘নবীগঞ্জের দৈত্য’ এবং ‘দুধসায়রের দ্বীপ’।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শিশু-কিশোর উপন্যাসের অন্তর্গত প্রায় সকল উপন্যাসই সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে চিহ্নিত করা যায়। তবে একটি উপন্যাসের সঙ্গে আরেকটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি, উপস্থাপনার পার্থক্য আছে।

**পাগলাসাহেবের কবর :** শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘পাগলাসাহেবের কবর’ উপন্যাসের কথক একজন সর্বজ্ঞ কথক। যিনি উপন্যাসের কাহিনির বাইরে রয়েছেন। কথকের বয়ান কখনো নিবিড়ভাবে আবার কখনো দূরত্ব বজায় রেখে হয়েছে। সর্বজ্ঞ কথক মারফত শুরুতেই পাঠক জেনে যাচ্ছে ডাক্তার গগনবাবুর বড়ছেলে হরিবন্ধু হল ‘গবেট।’[১] হরিবন্ধুর ব্যাপারে গগনবাবু ও তাঁর রোগী দুখিরামবাবুর মধ্যে পারস্পরিক কথাবার্তা হচ্ছে। নাটকের মতো এই পারস্পরিক কথোপকথনটা উপন্যাসের চরিত্রদের হয়ে থাকে এক্ষেত্রে। বাড়ি ফিরে দুখিরামবাবুর সঙ্গে হওয়া কথা গগনবাবুর মনে হল - গগনবাবুর ভাবনাটা কথক নিজের বয়ানে জানাচ্ছেন। যেহেতু কথক একজন সর্বজ্ঞ, তাই এই বাচন বা speech টা পরোক্ষে হচ্ছে বলতে পারি। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার কথক একটু সরে যাচ্ছেন। গগনবাবু ও তাঁর বড়ছেলে হরিবন্ধুর মধ্যে সংলাপ চালু হলে। যথারীতি দুখিরামবাবুর পরামর্শ মতো হরিবন্ধুকে তার বাবা মোতিগঞ্জ পাঠিয়ে দেন। সাঁওতাল পরগণার মোতিগঞ্জে দুখিরামবাবুর কেনা বাড়িতে হরিবন্ধুর থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। দেখভাল করার জন্য রয়েছেন দুখিরামবাবুর বাড়ির কাজের লোক জগুরাম ও তাঁর স্ত্রী ঝুমরি। ওখানকার চারুবালা বেঙ্গলি স্কুলে পড়ার জন্য হরিবন্ধু ভর্তি হয়। মোতিগঞ্জ জায়গার বর্ণনা সর্বজ্ঞ কথক জানিয়ে দিলেন বিস্তারিত ভাবে। মোতিগঞ্জের স্কুল, চারপাশের পরিবেশ, লোকজন নিয়ে হরিবন্ধুর মনে রহস্যময়তার সৃষ্টি হলেও আস্তে আস্তে ভালো লাগতে শুরু করে। সর্বজ্ঞ কথক পরোক্ষভাবে হরিবন্ধুর মনের কথা বলে দিচ্ছেন। হরিবন্ধু ভাবছে, যদি তাকে মোতিগঞ্জে থাকতে হয় তাহলে মন থেকে ভয় দূর করে ফেলতে হবে।

চরিত্রের সংলাপ ও কথকের বয়ান পাশাপাশি চলছে। এর মধ্যে কখনো কখনো কথকের নিজের মন্তব্য বা টিপ্পনী থাকে। এতে করে বুঝতে অসুবিধা হয় না উপন্যাসটিতে যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বা point of view প্রাধান্য পেয়েছে, তিনি সর্বজ্ঞ কথক। সর্বজ্ঞরীতিতে কথক প্রথম পুরুষের জবানিতে তুলে ধরলেন তাঁর বিবরণ। মোতিগঞ্জে “শেষ রাতে ফিকে একটু জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে। কুয়াশায় মাখা সেই জ্যোৎস্নায় চারদিকটা ভারী ভুতুড়ে আর অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এ যেন মানুষের রাজ্য নয়, কোনও রূপকথার জগৎ।”[২]

মোতিগঞ্জে এসে স্কুলে বন্ধু হয় গোপালের সঙ্গে হরিবন্ধুর। গোপাল আর সকলের থেকে অনেকটাই আলাদা বলে মনে হয় হরিবন্ধুর। গোপালের কাছ থেকে ক্লাসের বদমায়েশ ছেলেদের ব্যাপারে জানতে পারে সে। আবার চোর পটল দাসের সঙ্গে হরিবন্ধুর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। নিজের চুরি বিদ্যার ওপর ভারী গর্ব পটল দাসের। সর্বজ্ঞ কথক হয়েও তিনি দূরত্ব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 253 - 259
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বজায় রাখছেন হরিবন্ধু ও পটল দাসের মধ্যে চলা কথোপকথনে। মোতিগঞ্জের অনেক খবর, বিশেষ করে পাগলা সাহেবের বিষয়ে পটল দাস জানান হরিবন্ধুর জোরাজুরিতে। এখানে পটল দাসের বক্তব্যটা তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা নয়। তিনি অন্যদের থেকে জেনে, শুনে জানাচ্ছেন। কাহিনির ভেতরে চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে এক্ষেত্রে। গোপাল, পটল দাস, হরিবন্ধু এঁরা সবাই কাহিনির ভেতরে থাকা চরিত্র। কথক নন কেউই। কিন্তু কিছু কিছু সময় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে একাধিক প্রসঙ্গে। এঁরা কাহিনির ভেতরে থাকা আলাদা আলাদা চরিত্র। কারোর দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়, পরিবর্তন হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গিটা।

পটল দাসের থেকে জানার পর হরিবন্ধু এক কান্ড ঘটিয়ে ফেলে। তার নিজের ঘরের দেওয়ালে থাকা বড় অয়েলপেন্টিংটার পিছনের চৌকো ফাঁক দিয়ে সে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ফেরার সময় পথ হারিয়ে যায়। নিজের অজান্তেই একটা নীল রঙের আলো জ্বলা গোলঘরের মধ্যে পাগলাসাহেবকে দেখতে পায় হরিবন্ধু। পাগলাসাহেবের সঙ্গে কথা বলে, এমনকি তাঁর সাহায্য ও পায়। পরে এসব জানতে পেরে পটল দাস চড় মারে হরিবন্ধুকে। চড় খেয়ে হরিবন্ধুর অবস্থা সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে ‘থাবড়ায় তার ঠোঁট কেটে রক্তের স্বাদ ঠেকছিল জিভে।’[৩]

স্কুলে হেড মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে প্রশংসার পাশাপাশি পাগলা সাহেবের কবর সংক্রান্ত প্রচলিত একটা ছড়া বা সংকেত বাক্য হরিবন্ধু জানতে পারে। ছড়াটা –

> “হেঁটেও নয়, ছুটেও নয়, সাপের মতো। দূরেও নয়, কাছেও নয়, গভীর কত। আলোও নয়, অমাও নয়,
> যায় যে দেখা। আজও নয়, কালও নয়, ভাগ্যে লেখা।”[৪]

বলাবাহুল্য, ছড়া জানার আগে বা সংকেত বাক্য ভেদ না করেই নিজের অজান্তে হরিবন্ধু পৌঁছে গিয়েছিল পাগলাসাহেবের কবরের কাছে। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সংকেত বাক্যের ব্যবহার করেছিলেন পাগলা সাহেব তাঁর জীবিত থাকাকালীন সময়ে। সাহেবের মৃত্যুর পর কবর খুঁজে বের করে তাঁর গলায় থাকা দামি লকেট যে বা যিনি পাবেন, তিনি রাজা সমান লোক হয়ে যাবেন। ভালো লোকের পাশাপাশি খারাপ লোকেরা বেশি করে এসব খুঁজে পেতে তৎপর হয়। অপাত্রে পড়ে যাতে কোনো কিছু খারাপ না হয় তার আশঙ্কা ছিল সাহেবের। সেই জন্য তিনি সংকেত বাক্যের ব্যবহার করেছিলেন দূরদর্শী হয়ে।

স্কুলের বন্ধু আহত গোপালকে দেখতে যায় হরিবন্ধু। গোপালের বাড়ি গিয়ে হরিবন্ধু রহস্য ভেদ করে ফেলে। পাগলা সাহেব নামে পরিচিত হরিবন্ধু বা তার আরেক বন্ধু টুবলু বা অন্যান্য নিরীহ মানুষদের বাঁচাতে আসেন কেউ প্রায়শই। কিন্তু হরিবন্ধু বুঝে ফেলে তিনি না আসলে পাগলা আর না সাহেব। সর্বজ্ঞ কথক তাঁর অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়ে চরিত্র হরিবন্ধুর মনের ভাবনাকে তুলে ধরলেন পরোক্ষ বাচনভঙ্গিতে।

হরিবন্ধু ঘরে ফিরলে তার ঘরে নিজের উপস্থিতি জানাতে পটল দাস কাশির শব্দ করে ‘বিনীতভাবে’।[৫] এই পরিচয়টা যেহেতু কথক একজন সর্বজ্ঞ, তাই তাঁর পক্ষে বলে দেওয়া সহজ। কারণ তিনি সব জানেন।

পাগলা সাহেব সেজে পটল দাস, গোপাল, গোপালের বাবা ঝিকু সর্দার তাঁদের সাদা ঘোড়ায় চেপে হাজির হত মাঝে মাঝেই। তাঁদের উদ্দেশ্য যদিও খারাপ নয়। তাঁরা চাইতো সাহেবের দয়ালু পরিচয়কে বাঁচিয়ে রেখে মোতিগঞ্জে খারাপ কিছু হওয়া থেকে আটকাতে। কিন্তু পটল দাস যখন হরিবন্ধুকে রাগের বশে মারতে যান, সেই সময় কোনো সেজে থাকা লোক আসেননি। হরিবন্ধুকে বাঁচাতে সত্যি সত্যিই পাগলা সাহেব এসেছিলেন বলেই দাবি করেন পটল দাস। গোটা উপন্যাস জুড়ে পাগলা সাহেবকে কেবলমাত্র সরাসরি বেশ কয়েকবার দেখতে পায় হরিবন্ধু। আর একবার কিছুটা হলেও পটল দাস। দ্বিতীয় বার সুড়ঙ্গে ঢুকে খারাপ লোকদের কবলে পড়ে হরিবন্ধু। এমনকি পটল দাস, জগুরাম, জগুরামের স্ত্রী ঝুমরি ও তাঁদের ছোট দুটো বাচ্চা, গোপাল, গোপালের বাবা ঝিকু সর্দারদের ধরে এনে আহত করে খারাপ লোকেরা। আবারও পাগলা সাহেবের সাহায্যে সবাইকে নিয়ে বিপদ কাটিয়ে ওঠে হরিবন্ধু। খারাপ লোকেরা শাস্তি পায়। মোতিগঞ্জে আসতে না চাওয়া হরিবন্ধু উপন্যাসের শেষে মোতিগঞ্জ ছেড়ে যেতে চায় না।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 253 - 259
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

**নবীগঞ্জের দৈত্য :** শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘নবীগঞ্জের দৈত্য’ উপন্যাসের কথক একজন কাহিনির বাইরে থাকা সর্বজ্ঞ কথক। উপন্যাসটি আরম্ভ হচ্ছে শরৎ ঋতুর কোনো এক সকালের ‘চারদিকে বেশ নরম রোদ’[৬] - সর্বজ্ঞ কথকের বিবৃতিতে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, চারপাশের পরিবেশ, কোন মানুষটা কী করছেন সেই সব একে একে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন সর্বজ্ঞ কথক তাঁর প্রথম পুরুষের বয়ানে।

উপন্যাস শুরুর সামান্য পরে অল্প দূরত্ব বজায় রেখে কথক সরে যাচ্ছেন কিছু মুহূর্ত। পুঁটে সর্দার ও হলধর নাপিতের মধ্যে সরাসরি সংলাপ চলছে। সর্দার ও হলধর নাপিতের মধ্যে সরাসরি সংলাপ চললেও সর্বজ্ঞ কথক কিন্তু বেশিক্ষণ জায়গা ছাড়ছেন না। ওঁদের কথোপকথন শুনে আমাদের মনে হবে উভয়ের কথার কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছে না কেন? পাঠকের সংশয় দূর করার জন্য কথক সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিচ্ছেন ওঁরা দুজনেই কানে কালা। সুতরাং দুজনের কথাবার্তায় মিলের বদলে অমিল ফুটে উঠছে। কথক সর্বজ্ঞ হওয়ায় চারিদিকের বড়ো থেকে ছোট প্রায় সমস্ত তথ্যই দিয়ে দিচ্ছেন। দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যেক মাসে হলধর নাপিতের কাছেই পুঁটে সর্দারের মাথা ন্যাড়া করার কারণটাও আমরা সর্বজ্ঞ কথক মারফত জানতে পারছি।

সর্বজ্ঞ কথক কাছ থেকে নিবিড়ভাবে বিবরণ দিয়ে যাচ্ছেন। গল্প-উপন্যাসে চরিত্রের কোনো বৈশিষ্ট্যকে কথক তুলে ধরেন। তখন সেই বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে কথক তার ব্যাখাও দিয়ে থাকেন। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি -

(১) নবীগঞ্জের রাজবাড়ির বর্তমান উত্তরাধিকার বীরচন্দ্র সকলের থেকে আড়ালে থাকেন। কারণ নামে তিনি বীরচন্দ্র, কিন্তু আদতে সাংঘাতিক লাজুক।

(২) নবীগঞ্জের রাজবাড়ির সরকার মশাই ভুজঙ্গ হালদার বাজারে যাওয়ার সময় ছাতা হাতে ঝুলিয়ে রাখেন। আর তাঁর বাজারের থলে দিয়ে মাথায় চাপা দেন। কারণ তিনি খুব অন্যমনস্ক।

(৩) পুঁটে সর্দারের সঙ্গে রায়বাবু কথা বাড়াতে চাননা। কারণ রায়বাবু বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি জানেন পুঁটে সর্দার কানে শুনতে পান না। সুতরাং তাঁর সঙ্গে কথা বলা বৃথা।

সর্বজ্ঞ কথক মারফত নবীগঞ্জ এলাকার সবচেয়ে দুঃখী মানুষ দুঃখহরণ রায়ের কথা জানা যায়। তিনি মানুষ-জন, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গের সঙ্গে একে একে কথা বলতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রায় হঠাৎ করে তাঁর ওপর মাঝেমধ্যে অদৃশ্য গাট্টা, কাতুকুতু, সুড়সুড়ি বেড়ে চলেছে ক্রমশই। দুঃখহরণ রায় বুঝতে পারেন সবাই ব্যস্ত কিন্তু তিনি শুধু একা। চরিত্রের মনের ভাবনাকে সর্বজ্ঞ কথক জানাচ্ছেন পাঠকের কাছে। শুধু দুঃখহরণের নয়, রায়বাবুর মনের চিন্তাভাবনা সর্বজ্ঞ কথক বলছেন। দুঃখহরণবাবু কেন ছুটছেন সেটা রায়বাবু জানেন না। কিন্তু তাঁকে ছুটতে দেখে রায়বাবু ভাবছেন নানা কথা। দুঃখহরণবাবু কুঁড়ে লোক। আগে তিনি কখনো শরীরচর্চা করেননি। এখন শরীরচর্চা করছেন তাতে যে দুঃখহরণের উন্নতি হবে বলে মনে করছেন রায় বাবু। কিংবা রায়বাবু হতাশ হচ্ছেন দুনিয়াটা উচ্ছন্নে চলে যাচ্ছে ভেবে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, সর্বজ্ঞ কথকের বিবরণ হোক বা তাঁর Speech, সেটা অনেক বেশি।

গাট্টা খাওয়া থেকে রেহাই পেতে দুঃখহরণবাবু দৌড়াচ্ছেন। তাঁর দৌড়ানোর কারণ কেউ জানেন না। যে যাঁর মতো ভেবে নিয়ে যা খুশি করতে থাকে। পরিবেশ পরিস্থিতি এমনিই গোলমেলে হয়ে গেছে, যে অবস্থা বোঝাতে কথক বর্ণনা করছেন ‘সোজা কথায় নবীগঞ্জে হুলুস্থুলু কান্ড।’[৭]

নবীগঞ্জের রেলস্টেশনে একজন লম্বা চওড়া লোক ট্রেন থেকে এসে নামেন। তাঁকে ঘিরে এক একজনের এক একরকম মন্তব্য। প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গিটা আলাদা আলাদা। কাহিনির মধ্যে কোনো একজনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অন্যান্যদের একাধিক ধারণা। যেমন, ভজনলালের কাছে - বিভীষিকা, দৈত্য। পাঁচু চোরের কাছে - ব্রহ্মদৈত্য, অসুর। দুঃখহরণবাবুর কাছে - ভূত, দৈত্য। পুঁটে সর্দারের কাছে - যমদূত। এছাড়া ডাকাত, রাক্ষস কারো কারো কাছে। কিন্তু উক্ত উপন্যাসের কথক যেহেতু সর্বজ্ঞ। সুতরাং সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকটভাবে রয়েছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 28
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 253 - 259
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আবার উপন্যাস চরিত্রদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। পুঁটে সর্দার ও লম্বা চওড়া লোকটার মধ্যে যখন পারস্পরিক কথাবার্তা চলছে। তখন কথক কিন্তু মোটেই তাঁর জায়গা ছাড়ছেন না। কথকের মন্তব্যে জানা যাচ্ছে পুঁটে সর্দার থতমত খেয়ে 'কাষ্ঠহাসি'[৮] হাসলেন। হাসির ধরনটা যে 'কাষ্ঠ' অর্থাৎ কেমন সেটা বলে দেওয়া সর্বজ্ঞ কথকের পক্ষেই সম্ভব। চরিত্রদের মধ্যে কথার মাঝখানে কথক তাঁর নিজের মন্তব্য বা টিপ্পনী করতে ভুলছেন না। আগন্তুক লোকটার সঙ্গে নিজের কথার মারপ্যাঁচে কাবু করতে পারছেন পুঁটে সর্দার। সেটা বুঝে তাঁর মনে 'আশার আলোটা আরও উজ্জ্বল'[৯] হয়ে ঝলমল করছে। কথক মনের অবস্থাটাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার প্রয়োগে চিত্রকল্পের মাধ্যমে জানাচ্ছেন। চরিত্র যা বলেননি সেটা সর্বজ্ঞ কথক তাঁর সর্বজ্ঞতা দিয়ে তুলে ধরছেন।

লম্বা চওড়া লোকটাকে নিয়ে নবীগঞ্জের লোকজনের মধ্যে বিস্তর আলোচনা চলতে থাকে। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে সর্বজ্ঞ কথক নাক না গলালেও চারপাশের খবর পাঠককে দিতে ভোলেননি। আলোচনার কারণে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে হরিদাস ফিরি করছেন, পঞ্চানন চা বিক্রি করছেন, বাউল চরণদাস গান গেয়ে ভিক্ষা করছেন।

লম্বা চওড়া লোকটা সবশেষে রাজবাড়ি পৌঁছান। সেখানে তাঁকে আশ্রয় দিলেন গোপনে বীরচন্দ্র। বুদ্ধিমান মানুষ হওয়ায় মাধবচন্দ্র সেটা বুঝতে পারেন একমাত্র। যথারীতি রাজবাড়ী পৌঁছে মাধবচন্দ্রের অনুমান মিলে যায়। বীরচন্দ্র ও মাধব ঘোষালের থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। বীরচন্দ্রের বাবা পূর্ণচন্দ্র। তাঁর সময়ে দরবারের কুস্তিগির ছিলেন শঙ্কর সেনাপতি। লম্বা চওড়া লোকটা আসলে ওই শঙ্কর সেনাপতির একমাত্র ছেলে কিঙ্কর। কিন্তু কথক তাঁর জায়গা ছাড়বেন কেন। কিঙ্করের সঙ্গে কথা বলার পর মাধবের মনে কুডাক ডাকছে। কথক মাধবের মনের পুরো ভাবনাটাকে নিজের বয়ানে জানাচ্ছেন।

কিঙ্করের মাথায় চোট হওয়ায় তিনি সবাইকে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছেন না। তাও তাঁর অর্ধেক কথা থেকে বিষয়টা আন্দাজ করতে পারছেন মাধব ঘোষাল। ঘটনার রহস্যভেদ করতে তাই মাধব ঘোষাল কাজে লাগিয়ে দিলেন দুঃখহরণ, নিমাই ও নিতাইকে। নবীগঞ্জে খারাপ কিছু হতে পারে বলে অনুমান করেন মাধব ঘোষাল। যথারীতি তিনি গ্রামে পালা করে করে পাহারার ব্যবস্থা করান। প্রত্যেক পাহারা দেওয়া দলের সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে দুঃখহরণ যোগাযোগ বজায় রাখবেন।

সর্বজ্ঞ কথকের বর্ণনা ও চরিত্রদের সংলাপের মাধ্যমে জানা যায় কিঙ্কর বা ডাকাতদের আগমনের কারণ। রাজবাড়ির সিংহাসনের তলায় রয়েছে চার-পাঁচ মণ সোনা দিয়ে ঢালাই করা বেদি। নিজের স্মৃতিশক্তি কিঙ্কর ফিরে পায় পুনরায় ডাকাতদের আক্রমনে। বাবা শঙ্করের কথামত কিঙ্কর বেদির হদিস দেন বীরচন্দ্রকে। সেই সঙ্গে ডাকাতদল ও তাদের সর্দার রায় মশাই হাতেনাতে ধরা পড়ে। প্রাপ্ত ধনসম্পদ নিজে একা ব্যবহার না করে বীরচন্দ্র দিয়ে দিলেন সবার স্বার্থে। উপন্যাসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সর্বজ্ঞ কথকের বিবরণের পাশাপাশি দৃষ্টিভঙ্গি বা point of view -এর প্রভাব অধিক। কথক শুরুতে জানিয়েছিলেন নবীগঞ্জের সবচেয়ে দুঃখী মানুষ দুঃখহরণ বাবু। উপন্যাসের শেষে গিয়ে কথক জানাচ্ছেন দুঃখহরণ বাবুর আর কোনো দুঃখ নেই। শুরু থেকেই বোঝা যায় কথকের অবস্থান কাহিনির বাইরে থেকে। উপন্যাসে চরিত্র হয়ে কোথাও তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁকে পাওয়া যায় কেবল কথক হয়েই।

সর্বজ্ঞ কথকের পাশাপাশি চরিত্র কথকের উপস্থিতিও পাওয়া যায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শিশু-কিশোর উপন্যাসে। এই প্রসঙ্গে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে 'দুধসায়রের দ্বীপ' উপন্যাসকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

**দুধসায়রের দ্বীপ :** শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'দুধসায়রের দ্বীপ' উপন্যাসের প্রায় সমগ্র অংশ জুড়েই চরিত্রদের সংলাপের ব্যবহার হয়েছে। এখানে ঘটনা যা ঘটছে সেটাই সরাসরি উপস্থাপিত হচ্ছে। আলাদা করে কথকের বক্তব্য খুব বেশি থাকছে না সেভাবে।

"পুটু বলল, আচ্ছা, এই পুকুরটার নামই কি দুধের সর?

> খাসনবিশ চোখ কপালে তুলে বলল, পুকুর! এই সমুদ্দুরের মতো বিরাট জিনিসকে তোমার পুকুর বলে মনে হচ্ছে?"[১০]

এভাবে একের পর এক নানা বিষয় নিয়ে পুটু ও খাসনবিশের মধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা চলতে থাকে। প্রথম পরিচ্ছেদ জুড়ে কথক প্রায় অদৃশ্য হয়েই ছিলেন বলা যায়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কথক শুধুমাত্র জায়গাটার ভূমিকাটুকু আর সেই মুহূর্তে থাকা চরিত্রদের পরিচয় খুব অল্প কথায় পাঠককে জানিয়ে আবার সরে যাচ্ছেন। মাঝে মধ্যে কথক তাঁর সর্বজ্ঞতা দিয়ে চরিত্রদের মনের কথা জানান। কিন্তু পরক্ষণেই চরিত্রদের মধ্যে কথা দীর্ঘ সময়ের জন্য আবার চলতে থাকে। বোঝা যাচ্ছে কথকের বিবরণটা কম।

বিদ্যাধরপুর গ্রাম থেকে কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে বুড়ো শিবের পুরাতন মন্দির রয়েছে। মন্দিরে বসে পুরোহিত রসময় চক্রবর্তীর সঙ্গে জগাপাগলা কথা বলছেন। বামাচরণ নামের কোনো একজন ব্যক্তি জগাপাগলাকে বাঘ মারার জন্য পিস্তল দিয়েছে বিনা পয়সায়। সেই সঙ্গে বামাচরণ প্রস্তাব দিয়েছে রাজা প্রতাপচন্দ্রের শূল এনে দিতে। তার বদলে সে জগাপাগলাকে ভালো-মন্দ খাওয়াবে। কিন্তু কে বামাচরণ আর কেনই বা সে এত খাতির করছে সেটা জগাপাগলা জানেন না।

উপন্যাসের সর্বজ্ঞ কথকের দ্বারা উপস্থাপিত চরিত্র গগনবাবু। তিনি প্রথম তলের চরিত্রের পাশাপাশি দ্বিতীয় তলের চরিত্র কথক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মারফত পাঠক জানছেন বিদ্যাধরপুর গ্রামের লোকজন কেমন ধরনের। যেহেতু কাহিনির মধ্যে উপস্থিত গগনবাবু হলেন সেই চরিত্র, একমাত্র যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে। এমনকি পরবর্তীতে বামাচরণ ওরফে পরেশ ওরফে নফরচন্দ্র যে গগনবাবুর পূর্বপরিচিত ক্ষেত্রীলাল, সেটা তিনিই জানিয়ে দিচ্ছেন।

জগাকে নিজের নামের বদলে ভুল নাম জানিয়েছে ক্ষেত্রীলাল। পাগল পেয়ে জগাকে দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করাই ছিল ক্ষেত্রীলালের উদ্দেশ্য। জগা ও বামাচরণের কথার মধ্যে কথকের মন্তব্য যে বামাচরণের কথার প্যাঁচ জগা বুঝতে পারেননি। অর্থাৎ বামাচরণের কথার মধ্যে যে কোনো প্যাঁচ আছে, সেটা সর্বজ্ঞ কথক পাঠককে জানিয়ে দিলেন। তবে পুরোপুরি ঘটনা জানালেন না শুরুতে। একটা রহস্য রেখে দিলেন। সর্বজ্ঞ কথক রসময় চক্রবর্তীর মনের চিন্তা জগাপাগলাকে নিয়ে কিংবা তাঁর নিজের মনের মধ্যে যে একরাশ প্রশ্ন জেগেছে বা এসবের জন্য রসময় চক্রবর্তীর মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে - এসবটাই জানিয়ে দিচ্ছেন।

নানা রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনি এগিয়ে চলে। যথারীতি শেষের দিকে কাহিনির মধ্যেকার রহস্যের জট খোলে। বাতাসা দ্বীপ বা দুধসায়রের দ্বীপ যে গগনবাবুর মুখস্থের মতো সেটা সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে জানা যাচ্ছে। কারণ দ্বীপে নির্ভুলভাবে ধাপে ধাপে পৌঁছোনোর প্রমাণ দিয়েছেন গগনবাবু। একসঙ্গে গগনবাবু, রসময় চক্রবর্তী, দারোগা মদন হাজরা, কনস্টেবল গুলবাগ সিং দ্বীপে পৌঁছান। এছাড়াও আগে থেকে উপস্থিত ছিল দ্বীপে ক্ষেত্রীলাল ও তার মাসতুতো ভাই ধরণী। বর্তমান সময় থেকে পূর্বে ঘটে যাওয়া দুটো ঘটনা গগনবাবু বাকিদেরকে জানাচ্ছেন। প্রথমত, ছোটবেলায় কৌতূহলবশত দ্বীপে এসে নিজের চেষ্টায় গুপ্তধন আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর কোনো লোভ না থাকায় সেসবে হাত দেননি। দ্বিতীয়ত, পরবর্তীকালে মিলিটারিতে কাজের সময় তিনি তাঁর ছোটবেলার ঘটনা ক্ষেত্রীলালকে যে জানিয়েছিলেন সেটাও বর্তমানে জানান। লোভের বশবর্তী হয়ে ক্ষেত্রীলাল তাই বাতাসা দ্বীপে এসেছে বর্তমানে গুপ্তধন নিতে। পূর্বে ঘটা দুটো ঘটনাই গগনবাবুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। তিনি ওই অভিজ্ঞতার প্রধান চরিত্র। তাঁর কথা মতো 'আমিই এই ঘটনার পালের গোদা'।[১১] 'আমি' শব্দের প্রয়োগে বোঝা যাচ্ছে তিনি উত্তম পুরুষের জবানিতে তথা কাহিনিকে পরিবেশন করেছেন। কাহিনিগুলো সবটাই গগনবাবুর নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ। তাঁর বলা কাহিনিতে তিনিই প্রধান চরিত্র। তাঁর narratee বা শ্রোতারা কাহিনির মধ্যে থাকা অন্যান্য চরিত্রেরা। গগনবাবু যখন বলছেন তাঁর শ্রোতারা প্রত্যেকেই আখ্যান কাহিনির ভেতরে

উপস্থিত ছিলেন। তাঁর শ্রোতারা হলেন রসময় চক্রবর্তী, মদন হাজরা, গুলবাগ সিং, ক্ষেত্রীলাল, ধরণী। যদিও শ্রোতারা কেউই চুপ বা নীরবে থাকেননি। বেশিরভাগ জনের প্রশ্ন, মন্তব্য, বক্তব্য ছিল গগনবাবুর বক্তব্য বা বিবরণের সময়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত শিশু-কিশোর উপন্যাসগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর সর্বত্র বিরাজমানের ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। চরিত্র কথকের অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি সেই তুলনায় অল্প বলাই চলে। অনেকসময় সর্বজ্ঞ কথকের মতো আচরণ করতে চেয়েছেন চরিত্র কথক। কিন্তু কোথাও গিয়ে চরিত্র কথকের সীমারেখা অতিক্রম করেনি। চরিত্র কথককে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত থাকতে হয়েছে।

## Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, *পাগলা-সাহেবের কবর (কিশোর উপন্যাস সমগ্র প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট, ২০২২, পৃ. ৫১৯

২. তদেব, পৃ. ৫৩৯

৩. তদেব, পৃ. ৫৭২

৪. তদেব, পৃ. ৫৭৬

৫. তদেব, পৃ. ৫৭৯

৬. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, *নবীগঞ্জের দৈত্য (কিশোর উপন্যাস সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি, ২০২৩, পৃ. ৫৪৭

৭. তদেব, পৃ. ৫৫৬

৮. তদেব, পৃ. ৫৬৭

৯. তদেব, পৃ. ৫৬৮

১০. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, *দুধসায়রের দ্বীপ (কিশোর উপন্যাস সমগ্র তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নভেম্বর, ২০২২, পৃ. ৩৪১

১১. তদেব, পৃ. ৩৮৭